Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 134–144
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

পটচিত্র ও পটের গান : নয়া গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে

সমরেশ বাগ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: samareshju6509@gmail.com

Keyword
পটচিত্র, পটের গান, পটুয়া, নয়া, উপকরণ, অন্যন্য জীবিকা, ভবিষ্যত, সংগ্রহশালা

Abstract

Discussion
নগর সভ্যতার বহেমিয়ান জীবন জীবিকার মানুষ যখন বিভিন্ন কারণে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিরক্ত। তখন সেই পরিচিত জীবন থেকে একটু ছন্দপতন ঘটিয়ে প্রয়োজন পরে মনোরাজ্যের ভালোলাগার ঘরে ডুব মারার। আর সেই রকম একটা ভালোলাগার ঘর হলো অতীত বাংলার দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা পটচিত্র ও পটের গানকে কেন্দ্র করে। ছোটবেলা থেকে যখনই এই পটচিত্র বিষয়টি নজরে আসে টেলিভিশন কিংবা অন্যকোনো মেলা পার্বনকে কেন্দ্র করে। এবং সেখানে পট অঙ্কন ও সাযুজ্য রেখে খালি গলার সুরে গান বাঁধা যখন মনকে মোহিত করে দেয়। পাশাপাশি মনে উদয় হয় বিভিন্ন প্রশ্নের।এরা কোথায় বাস করে? কীভাবে এসব পটচিত্র অঙ্কন করা হয়? বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির পৃথিবীতে কীভাবে জীবনযাত্রা করছে কেবল এই পটচিত্রকে আশ্রয় করে? এদেরকি কেবল একটাই জীবিকা? তাদের সন্তানসন্তনীরা কীভাবে লালিত হচ্ছে এইরূপ পরিস্থিতিতে? এই পিটচিত্র মানুষ আদৌ কি কেনে? শোনে আধুনিক ডিজের যুগে মেঠে গলার গান? ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন। আর এই এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে একদিন হাজির হলাম ইট, কাঠ, সিমেন্টের বাঁধানো কম্পিটার ঘেরা জীবন থেকে মাটির পৃথিবীতে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অন্তর্গত নয়া গ্রামে। বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলেছি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে, শিশুরাও বাদ পড়েনি। কৌতূহল মিটিয়েছি অজানা প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করে। আমার আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই সব বিষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

পটচিত্র : সংস্কৃত 'পট' বা 'পট্ট' এর উল্লেখ পাওয়া যায় 'হরিবংশ', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম', 'উত্তরামচরিত' ইত্যাদি হাজার বছর আগে লিখিত কাব্যে। পট কথাটির সাধারণ অর্থ করলে আমার পাই চিত্র বা ছবি। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতে 'পট্ট' শব্দের অর্থ ছিল কাপড়।যে কাপড়ের উপর চিত্র লেখা হত সেই কাপড়টিকেই পট বলা হত। 'পট' শব্দটির জন্ম নিয়ে অনেক দিন ধরে আলোচনা হয়েছে। সংখ্যা গরিষ্ঠের মন্তব্য– ১. সম্ভবত কাপড়ের উপর ছবি আঁকার পদ্ধতি গোড়ায় খুব বেশি ছিল। পট শব্দ দ্বারাই তা অনুমিত হয়। ২. পট কথাটি এসেছে সংস্কৃত পট্ট বা পট থেকে এবং এর অর্থ হল

কাপড় বা বস্ত্রখন্ড। ৩. প্রথমত এই চিত্র কাহিনি যে কাপড়ের ওপর আঁকা হত, তার প্রমাণ পট্ট থেকে পট কথাটির অপভ্রঅংশের মধ্যে। ৪. বাংলাদেশে পট বলতে সেই চিত্রকে বোঝায়, যেটি কাপড়ে কিংবা কাগজের আঁকা।

ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকে রং ও রেখার মাধ্যমে পৌরাণিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক আখ্যান নির্ভর ছবি বা চিত্র নির্মাণ করার প্রচেষ্টা চলেছে। এবং তার কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় চর্যাপদে গীতিকা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গীতি, জয়দেবের পদাবলী, মনষামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গলের গানে।

পটচিত্র ভিন্নতা : পটুয়ারা সাধারণত তিন ধরণের পট তৈরি করে থাকেন। তার মধ্যে একটি হল কাহিনিযুক্ত জড়ানো বা দীঘল পট, আর একটি আড়াআড়ি ভাবে তৈরি জড়ানো পট, যাকে কেউ কেউ আড়লাটাই পট হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং সব শেষের পটটি হল চৌকো পট, যা বিশেষ ভাবে যাদুপট হিসাবে ব্যবহৃত। জড়ানো পট সাধারণত চওড়ায় হয় এক, দেড় বা দু'ফুট পর্যন্ত এবং লম্বায় শিল্পীর প্রয়োজন ও রুচি মত দীর্ঘ। কোনো কোনো পট বারো ফুট থেকে পঁচিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এত বড় পট হওয়ার জন্যে প্রদর্শনের সুবিধার্থে পটের দু'প্রান্ত আড়াআড়ি ভাবে কোনো কঞ্চির সঙ্গে জড়ানো থাকে। সেক্ষেত্রে পটের দুটি অংশ যেখানে কাঠির সঙ্গে জড়ানো হয়, যাতে কাঠি নড়াচাড়া করার সময় কাগজের পটের অংশ ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেই উদ্দেশ্যে।

বিষয়বস্তু অনুযায়ী পটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ১. ধর্মীয় পট এবং ২. সামাজিক পট। ধর্মীয় পটের বিষয় হল চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, বেহুলা লখিন্দর ইত্যাদি। আর সামাজিক পটের বিষয় হলো বৃক্ষরোপন, বধূনির্যাতন, পণ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি।

তবে স্থান অনুযায়ী পটচিত্রের নানা ধরণ দেখা যায়। বাংলার কালীঘাট, পিংলা, বর্ধমান ছাড়া বাংলার বাইরেও পটশিল্পীদের পটের চর্চা দেখা যায়। তবে দেবদেবীর গঠনগত দিক থেকে কালীঘাটের পটের ছবি কিছুটা স্থূলকায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি একটু মোটা করে আঁকা হয়। এরমধ্যে সূক্ষনাগরিক মনের ছায়া পড়েছে যেটা অন্যান্য পট চিত্রে দেখা যায় না।

বাংলার নিভৃত পল্লীগ্রামের দৈনন্দিন জীবনের চিত্রকলার যে সকল ব্যবহার সাধারণ পাওয়া যায় তা তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

প্রথম : 'পটুয়া' জাতির লোকেরা পুরুষানুক্রমিক প্রথানুসারে অঙ্কিত লম্বালম্বা চিত্রপট।

দ্বিতীয় : পল্লীগ্রামের মেয়েদের অঙ্কিত আল্পনা ও প্রাচীর চিত্র। এবং

তৃতীয় : মাটির ঘোড়া ও পুতুল এবং কাঠের পুতুল ইত্যাদির উপর চিত্রাঙ্কন। কিন্তু কালীঘাটের পটুয়ারা সবাই প্রায় এঁকেছেন ছোট ছোট ছবি, ঘর সাজানোর উপযুক্ত রাধা কৃষ্ণ, শিবদুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। দেবদেবীর ছবি ছাড়া ব্যঙ্গাত্মক ছবি ইত্যাদি তাঁদের ছবির বিষয় বস্তু ছিল।

চিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হল অন্যের অনুরাগ এবং নিজের চিত্ত বিনোদন। সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে চিত্রাঙ্কন শিল্পীর যথেচ্ছা চারের অবকাশ ছিল না। আর রেখায় চিত্রের প্রধান অঙ্গ। কারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির পরিমাণ ও সংস্থানের অভিব্যক্তি প্রথমত কেবল রেখার দ্বারায় হয়। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' এর চতু:ষষ্ঠি কলার যে নাম নির্দেশ দেখা যায়, তাতে আলেখ্য (চিত্র) চতুর্থ স্থানে। 'কামসূত্রে'র টীকাকার যশোধর 'ষড়ঙ্গ' বলে নির্দেশ করেছেন অর্থাৎ চিৎকরকে ছয়টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়। যথা- রূপভেদ, প্রমাণ, ভাবযোজন, লাবন- যোজন, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকা-ভঙ্গ।

পটুয়া : পটচিত্র যারা আঁকেন বা লেখেন তাদের আমরা পটুয়া বলে থাকি। তবে সবজায়গায় এদের পটুয়া বলা হয় না। পশ্চিমবঙ্গে পটুয়া, চিত্রকর, পটিকর, এবং পটদার নামেই পরিচিত। উত্তরপশ্চিম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় 'পটিদার' নামটিই বেশি পরিচিত। বীরভূম এবং মেদিনীপুরের কিছু জায়গায় 'চিত্রকর' নামটি একালে প্রচলিত, আর দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে পটুয়া শব্দটি ব্যাপকভাবে গৃহীত। তবে যে নামেই পট শিল্পীরা পরিচিত হোক না কেন কাহিনি রূপে রঙে ও ব্যবহারের চমৎকারিত্বে এবং সুরেলা কণ্ঠে সে চিত্রের বর্ণনা গণ-জ্ঞাপনের এক লৌকিক পরম্পরা। জাতি ধর্মেরও এক

স্বতন্ত্র ধরা তৈরি হয়েছে এই পটশিল্পীদের কেন্দ্র করে। চিত্রশিল্প, সংগীত রচনা ও গায়িক এই তিন ধারার সৌকর্যে শতশত বছর ধরে এই জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকায় বাংলার এক চিরায়ত রূপ দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম এবং মেদিনীপুর জেলাতেই অধিক সংখ্যক পটুয়াদের বাস। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ পটুয়াই ছিল গ্রামবাসি। তারা ছিল ভীষণভাবে দরিদ্র এবং সামাজিক ভাবে অবহেলিত। তাদের জীবনের মূল্য ছিল ডোকরা এবং কামারদের মতো। তাই এই সময় হিন্দু প্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে কিছু সংখ্যক পটুয়া নিজেদের মুসলমান বলে চিহ্নিত করতে চাইত। বিনয় ঘোষ এর 'বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' বিষায়ক গ্রন্থে ইসলাম প্রভাবিত পটুয়াদের বক্তব্য অনুসারে জানা যায় যে "তারা যদি হিন্দু হয়ে যায় তবে তাদের নিম্নবর্গভুক্তির জন্য আর তারা 'মানুষ' বলে গণ্য হবে না হিন্দুসমাজে।"[১] কিন্তু যদি তারা মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে তারা প্রতিবেশী মুসলমান দের কাছে অন্তত কিছুটা মানুষের মতো ব্যবহার পাবে। সুতরাং প্রকৃত মানুষের মতো জীবন ধারণের আশায় তারা ধর্মান্তারিত হয়েছিল একথা অনুমান করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের চিন্তাধারা ও বিষয়বস্তু অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা- ১. যে পটুয়ারা মূলত হিন্দু পৌরাণিক প্রসঙ্গই আঁকে। ২. যারা স্বর্গ ও নরকের ধারণা এবং মৃত্যুর দেবতা কর্তিক পাপীদের উপর যন্ত্রণার চিত্র ধরে। ৩. যে পটুয়ারা উপজাতির উৎস বিষয়ে (পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের মধ্যেই মূলত বেশি) এবং মৃতের মরজগৎ থেকে মৃত্যুর উদ্ধে জীবন বিষয়ে আঁকে।

নয়া-র পটুয়া সমাজের জীবন জীবিকা : আমরা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানা এলাকার নয়া গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানতে পারি যে সেখানকার পটশিল্প কেন্দ্র এখনও জীবিত। সেখানে পটুয়া পরিবার সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৭০ থেকে ৭৫। তাঁদের একমাত্র আয়ের উৎস্য হল এই পটশিল্প। এখানকার কয়েকটি চিত্র করের নাম হলো- শ্যামসুন্দর চিত্রকর, সুষমা চিত্রকর, বাহাদুর চিত্রকর, বড়মটু চিত্রকর, ছোটমন্টু চিত্রকর, প্রবীর চিত্রকর, জামাল চিত্রকর, গুরুপদ চিত্রকর, পুণ্য চিত্রকর, বিষ্ণুপদ চিত্রকর, খালেক চিত্রকর প্রমুখ। প্রত্যেকে এঁরা নিজেদের চিত্রকর বলে পরিচয় দেয় তা কেবল ছবি আঁকে বলে নয়। চিত্রকর হলো এঁদের পদবী যা তাঁদের বংশানুক্রমে পাওয়া।

নয়া গ্রামের পটুয়ারা হিন্দু পুরাণাশ্রিত রামায়ণ, মহাভারত, দাতাকর্ণ, মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, সীতাহরণ ইত্যাদি গান গাইলেও নিজেদের মুসলিম বলে চিহ্নিত করেন এবং মুসলিমদের সকল প্রকার আচার আচরণ মেনে চলেন। শ্যামসুন্দর চিত্রকরের (বয়স ৭৫) কাছ থেকে জানা যায় যে প্রায় ৭৫ বছর আগে নয়া জেলায় কোনো পটুয়ার বাস ছিল না। তাঁরা তাঁদের বাপ ঠাকুরদার সাথে জামনা, দুজিপুর, নারায়নগড় গ্রামে পট দেখিয়ে ধান ভিক্ষা করতে যেতন এবং সন্ধ্যাবেলায় এই নয়া জেলায় 'বিশাল' পদবী পাড়াতে বাড়ির মালিকের কৃপায় বাসা বেঁধে থাকতেন। তারপর তাঁরা দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে বাড়ির মালিক একটু থাকার জায়গা দিলে তাঁরা একটা ঘর বাঁধতেন, তারপর ক্রমশ দুটো, তিনটে এইভাবে পটুয়াদের বসতি স্থাপিত হয় বলে জানা যায়।

শ্যামসুন্দর চিত্রকরের কাছ থেকে আরও জানা যায় যে ৫০ বছর আগে তাঁদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল, কোনো বিয়ে হলে, বা অনুষ্ঠান হলে, কিংবা কেউ মারা গেলে তবে পটুয়াদের দিয়ে গান গাওয়ানো হতো, তবে কিছু উপার্জন হতো। তবে বর্তমানে নাকি তাঁদের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক স্বচ্ছল। তাছাড়া আমরা নিজেরা নয়া গ্রামে গিয়ে দেখেছি যে তাঁরা গ্রামের মধ্যে বসতি করলেও বিজ্ঞানের যুগে বর্তমানের সাথে তাল মিলিয়ে ইটের তৈরি বাড়িতে বাস করেছেন, টেলিফোন বা মোবাইল ব্যবহার করছেন, গ্যাসচুল্লি ব্যবহার করছেন ইত্যাদি।

বর্তমানে নয়া গ্রামের পটুয়াদের আয়ের উৎস পট বিক্রি এবং মাঝে মাঝে দলবেঁধে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে চাল পয়সা সংগ্রহ করা। শ্যামসুন্দর চিত্রকরের কাছ থেকে জানা যায় যে তাঁরা ৫০ বছর আগে তাঁর বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে কেবল শুনে শেখা পৌরাণিক গান গেয়েই সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু বর্তমানে অনেক শিল্পীই আছেন যারা কেবল ছবি আঁকতে পারেন কিন্তু গান গাইতে জানেন না। তাঁরা দল বেঁধে খাতা দেখে গান গেয়ে থাকেন। আমরা শ্যামসুন্দর চিত্রকরকে যখন জিজ্ঞাসা করি যে আপনি খাতা ব্যবহার করেন না, এত গান মনে রাখেন কীভাবে? তখন

তিনি আমাদের উত্তর দেন 'আমার খাতা আমার স্মৃতিতে, আমার খাতা দেখার দরকার হয় না' (শ্যামসুন্দর চিত্রকর)। তবে এখন তাঁরা আর শুধু পৌরাণিকগান গান না, তাঁরা এখন সামাজিক গান ও গান। তাঁদের সামাজিক গান গুলি খুব-ই সহজসরল এবং সকলের চেনা। এই সামাজিক গান গুলি কেন এলো? সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা জানান যে আগে রেডিও, টেলিভিশন ছিল না, তখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোকেদের গান শোনানো হতো। পরে রেডিও এলো সংখ্যায় খুবই কম, থানায় একটি। সবাই তখন দল বেঁধে রেডিও শুনতে যেত। তারপর টেলিভিশন আসার পরে পটশিল্প প্রায় শেষ হয়ে গেল। এই পটশিল্পকে বাঁচাতে নতুন সামাজিক পট দরকার। তাই বৃক্ষরোপন, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি নিয়ে নতুন পট রচিত হল।

রানী চিত্রকরের (বয়স ৬৫) কাছ থেকে জানা যায় যে বর্তমানে পটশিল্পের ঐতিহ্য কমছে না বরং বাড়ছে। তাঁদের এই পটশিল্প দেখার জন্য বিদেশ থেকে বহু পর্যটক আসছে এবং তাঁদের পটচিত্র ও গান শুনছে। এমনকি তাঁদের খরচ বহন করে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে চিত্র প্রদর্শনি ও গান শোনানোর সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি আমাদের জানান যে আগের থেকে বিভিন্ন রকম উৎসব অনুষ্ঠান এবং মেলার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে ফলে তাঁদের সেখানে পট দেখানো ও গান শোনানোর জন্য ডাক পরছে যেমন বর্ধমান, মেদিনীপুর, কলকাতা,খড়গপুর এছাড়াও আরো অন্যান্য জায়গা থেকে।

পটচিত্র আঁকার উপকরণ : আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে চিত্রকলা চর্চার যেসব উপকরণ ব্যবহার হয়েছে তা শিল্পীরা স্থানীয় কাঁচামাল থেকে প্রয়োজনমত তৈরি করে নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের পটশিল্পীরা নানারকম পাথর আন্যান্য দ্রব্য, গাছের পাতা, ফল ও ছাল থেকে রঙ তৈরি করেছেন। গাছের রস বা ফল থেকে আঠা হয়েছে। তুলি তৈরি করেছেন পশুর লোম থেকে।

পটের কাগজ : কলের কাগজ তৈরি হওয়ার আগে শিল্পীরা তুলট কাগজে পট আঁকতেন। তুলট কাগজ প্রধানত তুলো, পুরনো কাপড়, ভাতের মাড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হত। পটুয়ারা নিজের হাতে তা তৈরি করতেন।

তুলি : ছাগলের ঘাড়ের লোম অথবা কাঠবেড়ালির লেজের লোম বাঁশের কঞ্চির ডগায় সুতো দিয়ে বেঁধে তুলি তৈরি হয়। এখন অবশ্য প্রায় সকলেই বাজারের তুলি ব্যবহার করছেন। যে সব পটুয়াদের শহরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বা আর্থিক সংগটি নেই তাঁরাই কেবল নিজের হাতে তুলি তৈরি করেন।

রঙ : ১. লাল রঙ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সিঁদুর, আলতা।
২. হলুদ রঙের ক্ষত্রে কাঁচা হলুদের মূল বেটে রস বের করে রোদে শুকিয়ে প্রস্তুত করা হয়।
৩. সবুজ রঙের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সিম পাতার রস
৪. কাল রঙের ক্ষেত্রে হাড়ির তলার কালি, চাল পুড়িয়ে গুঁড় করে।
৫. খয়েরি রঙের জন্য পোড়ামাটি ঘোষে।
৬. সাদা রঙের জন্য ব্যবহার করে শঙ্খ, খড়িমাটি ঘষে।

আঠা : বাবলা গাছের রস জমাট বেঁধে জায়। তা ভিজিয়ে রেখে আঠা তৈরি হয়। তেঁতুল বিচি ভিজিয়ে রেখে কয়েকদিন বাদে তার থেকে লেই বের করে কাপড়ে ছেকে আঠা হয়। কচুর রস থেকেও আঠা হয়। তবে বেলের আঠা খুবই প্রচলিত মাধ্যম।

গ্রাম আর আগের মত নেই। সব কিছুতেই আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। ফলে জীবনও পাল্টেছে অনেক। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস মানুষ আগে নিজেই তৈরি করে নিত। সে সবের এখন প্রায় সব কিছুই বাজারে পাওয়া যায় ফলে মানুষ এখন বাজারমুখি। এতে সময় ও শ্রম দুটোয় বাঁচে।

নয়া-র পটশিল্পর পাশাপাশি অন্যান্য জীবিকা : নয়া গ্রামে সকলের সাথে কথা বলে জানতে পারি যে এখন অনেকেই পটশিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য জীবিকার সাথে যুক্ত হচ্ছেন।যেমন ১.পটচিত্র এঁকে গান গেয়ে ভিক্ষা করা। ২.শুধু মাত্র পটচিত্র এঁকে অন্যকে বিক্রি করা ৩. মাটির পুতুর তৈরি করে বিক্রি। ৪. প্রতিমা তৈরি করা। ৫. গুণিন বা ওঝা হয়ে মন্ত্র দ্বারা লৌকিক চিকিৎসা করা। ৬. বিভিন্ন রকমের রঙ তৈরি করে বিক্রি। ৭. বেদে পটুয়ারা সাপ ধরে বিক্রি করে। ৮.দেবী পট আঁকে। ৯. ফেরিওয়ালার কাজ করে। ১০. কৃষি কাজ করে। ১১. জনমজুর খাটে। ১২. রিক্সা চালায়। ১৩. গ্রিটিংস কার্ড ও ক্যালেন্ডার তৈরি করে। ১৪. ছোট খাট ব্যবসা করে ইত্যাদি।

পটচিত্র ও পটের গানের পারস্পরিক তুলনা : নয়া গ্রামে গিয়ে আমরা শ্যামসুন্দর চিত্রকরের কাছ থেকে কয়েকটি ছবি সংগ্রহ করি। যেগুলি তিনি নিজে তৈরি করেছেন এবং সেই ছবি গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গান তৈরি করেছেন। এই গানগুলি আকারে খুবই ছোট, তিন চার লাইনের গান। কিন্তু এই গানগুলির মধ্যে থেকে একটি নীতি শিক্ষার আভাস ফুটে ওঠে। এই পটগুলি এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গান গুলি হল- ১. কালিদাস এবং সরস্বতীকে নিয়ে ২. চৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে।৩. বৃক্ষরোপনকে কেন্দ্র করে। ৪. মনসাকে নিয়ে আঁকা পট।

- তাঁর কালিদাস এবং সরস্বতীকে নিয়ে অঙ্কিত পটটি হল-

এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে মিল রেখে গান রচনা করেছেন-

"কালিদাস মূর্খ ছিল তাই
সরস্বতীর আশীর্বাদে পন্ডিত হয়ে যায়
সেই জন্য বলছি আমরা লিখাপড়া প্রয়োজন
শুনেন সর্বজন"

- তাঁর চৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে অঙ্কিত পটটি হল-

এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গান রচনা করেছেন-

"সন্ন্যাস যদি হবে স্বামী মনে চিত্তে জান।
তবে কেন পরের মেয়ে বিয়ে করে আন?
এত বলে বিষ্ণুপ্রিয়া কেশ নাহি বাঁধে
ধরিয়া স্বামীর পায়ে ফুফারিয়া কাঁদে"।

- তাঁর বৃক্ষ রোপন নিয়ে অঙ্কিত পটটি হল এই :

এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মিল রেখে গান বেঁধেছেন-

"সবাই মিলে করো গাছ রোপন
গাছ লাগইলে পরে মানুষের উপকার করে
বাতাসে নির্শ্বাস ভরে গাছের-ই ধরণ
ও জনগণ সবাই মিলে করো গাছ রোপন"

- মনসাকে নিয়ে তাঁর অঙ্কিত পটটি হল-

এবং তার সঙ্গে মিল রেখে গান রচনা করেছেন-

"সাঁওতাল পর্বতে আছে লোহার বাসরঘর
তায়ে শুয়ে নিদ্রা যায় কান্তলখিন্দর
ওঠো ওঠো ওগো রামা সায়বেনের ঝি
তোরে এল কালনিন্দ্রা মোরে এল কী?"

নয়া-র নারী কণ্ঠে গীত : নয়া গ্রামে গিয়ে আমরা রানী চিত্রকরের কাছ থেকে কিছু গান শুনি। যেমন চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, পোলিও খাওয়ানো, সীমান্ত মশান ও সুনামির উপর। এই গানগুলি যেহেতু খুব দীর্ঘ হয় তাই পটগুলিও আকারে অনেক দীর্ঘ হয় এবং পটগুলি এই গানের সাথে মিল রেখে আঁকা হয়। এবং যখন গাওয়া হয় তখন পটে আঁকা ছবির উপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে গানগুলি গাওয়া হয়।

তাঁদের গাওয়া সুনামির উপর গানটি হলো-

"অভিসত্ব (অভিশপ্ত) সুনামিতে কেড়ে নিল প্রাণ (২)
শিলঙ্কা আর থাইল্যান্ড আর আন্দামান
অভিসত্ব (অভিশপ্ত) সুনামিতে কেড়ে নিল প্রাণ।
২০০৪ সালে হল যে সুনামি
শতবছরের বৃদ্ধ বলে দেখিনিত আমি
হায়রে দেখিনিত আমি
ছেলে বুড়ো সবাই তাতে হারালো যে প্রাণ
অভিসত্ব সুনামিতে কেড়ে নিল প্রাণ।
খবর পেয়ে চলে আসে সাংবাদিকের দল
উদ্ধার করে ও মানুষ ফেলে চোখের জল
শুধু ফেলে চোখের জল
কেনো তুমি নিলে বলো এতগুলো প্রাণ
অভিসত্ব সুনামিতে কেড়েনিল প্রাণ।
বিধির তোর নিলাখেলা (লীলাখেলা) বোঝা বিষণ দায়
কাহারে হাসাও তুমি কাহারে কাঁদাও
দয়াল কাহারে কাঁদাও।
কেন তুমি ভাঙলে বলো সুখের আন্দামান
অভিসত্ব সুনামিতে কেড়েনিল প্রাণ।
সমুদ্রেরো মাতা মাগো গঙ্গা জননী
এতগুলি প্রাণকে কেন কেড়ে নিলে তুমি
মাগো কেড়ে নিলে তুমি।
কেন তুমি ভাঙলে বলো সুখের আন্দামান
অভিসত্ব সুনামিতে কেড়ে নিল প্রাণ।
শিলঙ্কা আর থাইল্যান্ড আর আন্দামান
অভিসত্ব (অভিশপ্ত) সুনামিতে কেড়ে নিল প্রাণ"।

এই গানটি তাঁরা ২০০৪ সালের ভয়াবহ সুনামির পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেছেন। এই গানটির মূল বিষয় হলো যে ২০০৪ যে ভয়াবহ সুনামি হয়েছে তার কবলে পড়ে অনেক মানুষ মারা যায়, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই গানের মধ্য দিয়ে দেবতাকে নালিশ করা হয়েছে যে মা তুমি এত গুলো মানুষের প্রাণ কেন কেড়ে নিলে। এই গানটির মধ্যে থেকে তাদের ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। একই সাথে ধরা পড়ে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা। তারা অভিশপ্তকে উচ্চারণ করছে

অভিসত্ব, লীলাকে উচ্চারণ করছে 'নিলা' এবং শ্রীলঙ্কাকে উচ্চারণ করছে 'শিলঙ্কা'।তারা প্রাকৃতিক শক্তিকে দৈবীমহিমায় অনুভব করছেন।

তাদের সামাজিক পালসপোলিও মূলক গানটি হল-

"পালসপোলিও খাওয়াতে ভুল করছো যদি
সারবে না রোগ প্রচার করছি, আমি।
শিশুকে খাওয়াতে ভুল করেছো যদি
সারবেনা রোগ প্রচার করছি আমি।
ডাক্তারকে পয়সা দিলেও কিছু হবে না
একটা কথা বলছি শোন না।
শোন শোন মা বোনেরা ও দাদা আর ভাইয়েরা
একটা কথা বলছি শোন না
শিশুকে,পালসপোলিও খাওয়াতে ভুলোনা।
শিশুকে পালস পোলিও খাওয়ান হবে না রোগ পাবে রেহাই
তাইতো বিজ্ঞানের বলছে শোন না
তোমরা শিশু ভালো রবে সুস্থ্য সরল সতেজ হবে
শিশুর প্রতি অবহেলা করো না।
শোন শোন মা বোনেরা ও দাদা আর ভাইয়েরা
একটা কথা বলছি শোন না
শিশুকে, পালস পোলিও খাওয়াতে ভুলো না।
একদিনের শিশুহলেও পালসপোলিও খাওয়াও তারে
পাঁচবছর পর্যন্ত।
সর্দিকাশি জ্বর হলে ভয়ের কিন্তু নাই করণ (২)
পালসপোলিও খাওয়াতে ভুলো না
ও মায়েরা একটা কথা বলছি শোন না।
শোন শোন বোনেরা ও দাদা আর ভাইয়েরা
একটা কথা বলছি শোন না, শিশুকে পালস পোলিও খাওয়াতে ভুল না।
আপনারা শিশুকে পালসপোলিও খাওয়াতে ভুলো না"।

এটি প্রচারধর্মী গান। এই গানটি দেখে বোঝা যায় যে এটি সামাজিক সমস্যামূলক গান। এবং এগুলি গণসচেতনতা বাড়াবার জন্যই রচনা করা হয়েছে। পালসপোলিও খাওনার ফলে কী কী উপকার পাওয়া যায় তা এখানে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে পালসপোলিও খাওয়ানোর ফলে শিশুর সর্দি, কাশি,জ্বর হলেও কোনো ভয় নেই।এই গানের মাধ্যমে নিশ্চিত করে বলা হচ্ছে যে শিশুর একদিন বয়স থেকে পাঁচবছর বয়স পর্যন্ত পোলিও খাওয়ানো উচিত।

পটচিত্র ও পটের গান শিশু কণ্ঠে : তবে কাহিনি রূপে রঙের ব্যবহারের চমৎকারিত্ব এবং সুরেলা কণ্ঠে সে চরিত্রের বর্ননা শুধু বড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আমরা ছোটদের মুখেও একটি পটের গান শুনি যাদের মধ্যে একজনের নাম সইদুল চিত্রকর বয়স ছয় বছর, ক্লাস ওয়ানের ছাত্র। অন্যজন হল রূপালী চিত্রকর যার বয়স নয় বছর, ক্লাস টু'র ছাত্রী। এছাড়া আরো একজন হল শম্পা চিত্রকর যার বয়স বারো বছর, ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। এই পটের গানটি মাছের উপর। গানটি হলো-

"দেড়িয়া মাছের বিয়ে করাতে চলোগো রঙ্গিলা। (২)
কাতলা মাছ বলে আমি, কাতলা মাছ বলে আমি বিয়ের বাঁশি বাজাবরে রঙ্গিলা।
দাঁড়িয়া মাছের বিয়ে করাতে চলগো রঙ্গিলা। (২)
সাইপন মাছ বলে আমি, সাইপন মাছ বলে আমি বিয়ের খাবার খাবগো রঙ্গিলা।

দাঁড়িয়া মাছের বিয়ে করাতে চলোগো রঙ্গিলা। (২)
ইলিশ মাছ বলে আমি, ইলিশ মাছ বলে আমি পালকি চড়ে যাবগো রঙ্গিলা।
দাঁড়িয়া মাছের বিয়ে করাতে চলগো রঙ্গিলা। (২)
পাকাল মাছ বলে আমি, পাকাল মাছ বলে আমি বিয়ের ঢোলক বাজাবগো রঙ্গিলা।
দাঁড়িয়া মাছের বিয়ে করাতে চলগো রঙ্গিলা।
বোয়াল মাছ বলে আমি, বোয়াল মাছ বলে আমি সব শালাকে খাবগো রঙ্গিলা।
দাঁড়িয়া মাছের বিয়ে করাতে চলগো রঙ্গিলা।
পুঁটি মাছ বলে আমি, পুঁটি মাছ বলে আমি বিয়ের বাঁশি বাজাবগো রঙ্গিলা।
দাঁড়িয়া মাছের বিয়ে করতে চলগো রঙ্গিলা। (২)
চিংড়ি মাছ বলে আমি, চিংড়ি মাছ বলে আমি হারমনিয়াম বাজাবগ রঙ্গিলা।
দাঁড়িয়া মাছের বিয়ে করাতে চলগো রঙ্গিলা। (২)

এই গানটি একটি সামাজিক গান। এই গানটি শিশুদের উদ্দেশে রচনা করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। গানটি গেয়েছে কয়েক জন বালক বালিকা। গানটি দাঁড়িয়ে মাছের বিয়ের কথা বলা হয়েছে, এবং তার বিয়েতে কোন কোন মাছ যাবে এবং তারা কী কী কাজ করবে সে কথাও বলা হয়েছে। গানটিতে শব্দ উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট দিক ধরা পড়ে তারা দাঁড়িয়া মাছকে প্রথমে গানের শুরুতে বলছে দেড়িয়া মাছ।

নয়া-র পটুয়াদের ভবিষ্যৎ : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অন্তর্গত নয়া গ্রামের এই মানুষজন পটশিল্পটাকে তাঁদের জীবনের সাথি করে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আগে তাঁদেরর রোজকারের একমাত্র উৎস ছিল পটচিত্র অঙ্কন করা এবং সেই পুরানাশ্রিত দেবদেবীর মাহাত্ম্য গানের আকারে প্রকাশ করা। নয়াগ্রামে আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানতে পারি যে তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনকে সুনিশ্চিত করার জন্য পৌরাণিক পটের সাথে যুক্ত করেছেন সামাজিক পটচিত্র, এমনকি তাঁরা কিছুটা পরিমান রাজনৈতিক ভাবেও যুক্ত হয়েছেন।

আগে তাঁদের পৌরাণিক পটচিত্র অঙ্কনের বিষয় ছিল রামায়ণ, মহাভারত, দাতাকর্ণ, মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, সীতাহরণ ইত্যাদি। কিন্তু এখন তাঁদের সামাজিক পটচিত্রের বিষয় হল সমাজে ঘটে চলা ঘটনা। বর্তমান সমাজে ঘটে চলা ঘটনাকেই তাঁরা তাদের পটের বিষয় হিসাবে তুলে ধরেছেন যেমন নারীর হাতে স্বামীর খুন, তিনকন্যা হত্যা, নারীর হাতে ড্রাইভারের খুন ইত্যাদি। এখন তাঁরা কিছুটা পরিমাণ রাজনৈতিক ভাবেও যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের রাজনৈতিক বিষয় হল কন্যাশ্রী প্রকল্প, পরিবেশদূষণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে। এই সব বিষয়ে পট অঙ্কন করে এবং সেগুলির সঙ্গে মিল রেখে গান তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় সভার আয়োজন করে তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রচারমূলক কাজেও অংশ গ্রহন করছেন।

এছাড়া তাঁরা শিল্পটাকে নতুন পদ্ধতিতে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য কলকাতা থেকে টিশার্ট, শালওয়ার কামিজ, কাপড়, ওড়না ইত্যাদি কিনে এনে তার উপর পট চিত্র তুলে ধরছেন। নিজেদের হাতে হাত পাখা তৈরি করে তার উপর বিভিন্ন পটচিত্র তুলে ধরেছেন। কাগজে আঁকা বিভিন্ন পটচিত্রের উপর প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করলেও তাঁরা কিন্তু এইসব টি-শার্ট, ওড়না, শালওয়ার কামিজ, কাপড়, পাখা ও ব্যবহারিক ফেব্রিকের জিনিসের জন্য আধুনিক রঙ ব্যবহার করছেন। অর্থাৎ তাঁদের পট শিল্পের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আধুনিকতার প্রভাব পড়েছে একথা বলা যেতে পারে।

সংগ্রহশালা : নয়াগ্রামের এই পটুয়াগণ যৌথ উদ্যোগে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন। এটি মূলত গড়ে উঠেছে পটশিল্পকে তুলে ধরার জন্যই। এই সংগ্রহশালায় রয়েছে বিভিন্ন বই ও পত্রপত্রিকা যেগুলির বেশির ভাগ-ই ইংরেজিতে লেখা। যেমন- *'My Mother', 'A Tribute to Jamini Roy', 'Crafting/Indian Scripts', 'INDIAN FOLK ART',*

'artanddeal' প্রভৃতি। সংগ্রহশালার দেওয়ালে বহু পটচিত্র সাজানো আছে যেগুলির বেশির ভাগ পৌরাণিক পটচিত্র। যেমন কৃষ্ণ কালিও দমনের মাথায় নৃত্যরত চিত্র, কৃষ্ণগাছের ডালে বসে আছে এবং রাধাও তার সখীরা স্নান করছে, কৃষ্ণ রাধার শর্তবসত ননীর হাঁড়ি বয়ে দিচ্ছে ইত্যাদি। এছাড়া এই সংগ্রহ শালায় রয়েছে মাটির কারুকার্য যেগুলি এই পটুয়া পড়ার লোকেরাই নিজেদের হাতে তৈরি করে এখানে রেখেছেন। যেমন ঘট, বিভিন্ন রকমের পুতুল, শাঁক, ভান্ডার প্রভৃতি যেগুলি আধুনিক রঙ দিয়ে সজ্জিত করে এখানে রাখা হয়েছে। এছাড়া এখানে রয়েছে বেশ কিছু সৌখিন দ্রব্য যেগুলি দেখে মনে হয় এগুলি তাঁরা নিজের হাতে তৈরি করেননি বাইরে থেকে নিয়ে এসেছেন। যেমন শ্বেতপাথরের তৈরি হাতি, মাছ, কচ্ছপ বিভিন্ন মূর্তি। এছাড়া এখানে রয়েছে বাঁশ দিয়ে তৈরি বেশ কিছু পেনদানি যেগুলির উপর সুন্দর সুন্দর মাছের ছবি, ফুলের ছবি, গাছের ছবি অঙ্কন করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, বিনয়, বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, পৃষ্ঠা- ১০৩

গ্রন্থপঞ্জি :

১. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদক), বঙ্গীয়লোকসস্কৃতিকোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা, ৭০০০০৯, ডিসেম্বর, ২০০৭
২. দীপঙ্কর ঘোষ, বাংলা পটেরদুর্গা, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেণিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১৫
৩. বিনয় ঘোষ, বাংলা লোকসস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগল কিশোর দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, তৃতীয়, মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪০৬
৪. বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকথা, অরুণা প্রকাশণী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৭০০০৬, দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৬
৫. ভোলানাথ ভট্টাচার্য, পট ও পটুয়া-কথা এবং অন্যান্য কথা মালা, বই পত্তর, ইন, ৮, রাস্তা ১, নবদিত, নয়াবাদ, মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০০৯৯, জানুয়ারি ২০১৭
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লিপিকা, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
৭. রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, পটুয়াকথা, প্রতিক্ষণ, ৭ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা ৭০০০১৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১০
৮. অশোক ভট্টাচার্য (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, ৭০০০৬৮, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০১